স্মরণাঞ্জলি

# কিন্নরকণ্ঠী যূথিকা রায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা প্রসঙ্গ

## সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

২০১৪ সালের গোড়ার দিক। দু-জন প্রথিতযশা শিল্পী আমাদের ছেড়ে গেলেন। এই দুই প্রতিভাময়ী নারী জীবনের সৃষ্টিশীল অধ্যায় পার হয়ে এসেছিলেন বহুদিন। তবে তাঁদের মধ্যে একটি বিশেষ মিল ছিল—তাঁরা দুজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে গভীরভাবে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথমজনের জীবনের যবনিকা নেমেছিল দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে—১৭ জানুয়ারি ২০১৪। তিনি অবিস্মরণীয়া চিত্রতারকা সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪)। তাঁর রামকৃষ্ণগত জীবনের বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, জেনেছি সেই অপরিসীম আশ্রয়ের মহিমময় আবহে কীভাবে তিনি পার্থিবজীবনের অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে স্থিত হতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয়জনের জীবনাবসান ঘটেছিল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে—৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। তিনি খ্যাতকীর্তি গায়িকা যূথিকা রায় (১৯২০-২০১৪)। এই দ্বিতীয়জনের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভজনার বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না।

গ্রামবাংলার সবুজ কোলে বেড়ে-ওঠা শান্ত বালিকা। জয় করলেন মুম্বই থেকে সিংহল। গান্ধিজী, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু—সবাই ব্যাকুল তাঁর ভজন শুনতে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে তাঁর আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন। ভারতীয় সংগীতের গগন ছেয়ে গেল অনাঘ্রাত যূথিকার পবিত্র সুরভিতে।

আত্মস্মৃতির অজস্র অমূল্য উপাদানের মধ্যে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গভীর অনুভূতির কিছু হদিশ রেখে গেছেন। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিষয়ক স্মৃতিচারণের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আদর্শবোধের দ্যোতনা আছে—তেমনই আছে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের চলমান ইতিহাসের মধ্যে স্থানলাভের যোগ্য। সেকথায় প্রবেশের পূর্বে এই কিংবদন্তি শিল্পী সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নেব। আজ যাঁদের বয়স ষাটোর্ধ্ব, তাঁরা যূথিকা রায়কে হয়তো চিনবেন, কিন্তু স্বল্পবয়সীদের জ্ঞাতার্থে সামান্য তথ্য সংযোজন প্রয়োজন।

যূথিকা রায়

দুই

হাওড়া জেলার আমতায় ১৯২০ সালের ২০ এপ্রিল যূথিকার জন্ম। বাবার বদলির চাকরির সূত্রে ঘুরেছেন নানা জায়গায়—যেমন অধুনা বাংলাদেশের সেনহাটী, বাগেরহাট ও টাঙ্গাইল। পরে ১৯৩০ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায়। ১৯৩৪ সালে প্রথম রেকর্ড করেন, সে-গান আজও বিখ্যাত—‘আমি ভোরের যূথিকা’ এবং ‘সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে’। এরপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, সাফল্য নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সারা ভারতে গান শুনিয়েছেন, গিয়েছেন সিংহল ও পূর্ব আফ্রিকা। দেশের মধ্যে যেসব রেডিও স্টেশনে গান করেছেন তার মধ্যে আছে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, জলন্ধর, জম্মু ইত্যাদি। পদ্মশ্রীর সম্মান পেয়েছেন ১৯৭২ সালে। মোট রেকর্ডের সংখ্যা ১৭৯। সেইকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, নিজের অসামান্য জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি সিনেমার জন্য গান প্রায় করেননি। নিজেই জানিয়েছেন : ‘‘সিনেমা জগতে প্লে-ব্যাক গান আমি খুব কম গেয়েছি। আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল গাইব না। কারণ তখন আমি গ্রামোফোন কোম্পানিতে মীরাবাঈ, কবীর, ভজন গানে মাতোয়ারা এবং সকল শ্রোতাগণ এই ভক্তিরসপূর্ণ গানে ডুবে গিয়েছিলেন। এই ভক্তিভাব যাতে নষ্ট না হয়, তারই জন্য এই দৃঢ় সংকল্প। অনেক বড় আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিনি।”

তবে অতি স্বল্প কিছু গান তিনি সিনেমার জন্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, হয় কোনও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির অনুরোধে অথবা সেগুলি ভজন বলে। যূথিকা রায়ের সংগীতজীবনের বিশেষ কিছু ঘটনার কথায় প্রবেশের আগে তাঁর লেখনীতে প্রাপ্ত এই ইতিহাস অতীব মূল্যবান : ‘‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে দুখানি ভক্তিমূলক গান রচনা করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গান দুটি এই—‘পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার’ এবং ‘জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর।’... গ্রামোফোন কোম্পানির তরফ থেকে কমল দাশগুপ্ত ও আমাকে দিয়ে দ্বৈত কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয়। এই ভক্তিমূলক গানদুটির সুরকার কমল দাশগুপ্ত।”

সরোজিনী নাইডু ছিলেন যূথিকার গানের একান্ত ভক্ত। ১৯৪৭ সাল, গান্ধীজী রয়েছেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে। সরোজিনীর নির্দেশে একদিন সকাল সাতটায় যূথিকা গেলেন তাঁর দর্শনে। সেই অভিজ্ঞতার কথা জেনেছি যূথিকার কাছ থেকে : ''আমি ও মা ভিতরে গেলাম। দেখলাম বাপুজি একটি মাদুরের উপর বসে খাতার পাতায় কী সব লিখছেন, খালি গা, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, সমস্ত শরীর ও মুখ থেকে যেন জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে। এত পরিশ্রমের মধ্যে যেন কোনও ক্লান্তি নেই। মুখে হাসি, চোখ উজ্জ্বল, যেন প্রেমময়, শান্তির প্রতিমূর্তি।... আভা [গান্ধি] জানাল যে বাপুজির এখন এক মিনিটও সময় নেই, কিন্তু আমার ভজন শোনবার জন্য উৎসুক, তাই ঠিক করেছেন, পাশের ঘরে যখন তিনি স্নান করবেন, তখন আমি এই ঘর থেকে পর পর বাপুজির প্রিয় ভজনগুলো যেন গেয়ে শোনাই। বাপুজি পাশের ঘরে চলে গেলেন, আমি খালি গলায় কোনও যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে একের পর এক ভজন শুনিয়ে গেলাম।... স্নান শেষ করে বাপুজি আমার সামনে দাঁড়ালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। তিনি প্রাণভরা হাসি হেসে আমায় হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।... পরে আভা জানাল বিকাল ৪টায় ময়দানে যে প্রার্থনাসভা হবে, সেই প্রার্থনাসভায় আমায় যোগ দেবার কথা বাপুজি বলেছেন।'' সেইমতো যূথিকা সেদিন গান্ধিজীর সঙ্গে সেই সভায় গিয়েছিলেন এবং প্রার্থনাসভা শেষ হওয়ার পর গান্ধিজীর উপস্থিতিতে অগণিত শ্রোতার সামনে ভজনগান শুনিয়েছিলেন। এইভাবেই আভা গান্ধি ও পরে তাঁর বাবা-মা ও ভাইবোনের সঙ্গে যূথিকার হৃদ্যতার সূত্রপাত।

এরপরের ঘটনা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস। দিল্লি রেডিও স্টেশন থেকে যূথিকা আমন্ত্রণ পেলেন গান গাইবার। তিনি লিখেছেন : ''... ভোর ৬টায় দিল্লি রেডিও স্টেশনে গান ব্রডকাস্ট করবার পর যখন আমি স্টুডিওর বাইরে এসেছি ঠিক সেই সময় দিল্লি রেডিওর জনৈক কর্মকর্তা এসে জানালেন আমায় তখনই আবার Broadcast করতে হবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছ থেকে ফোনে বিশেষ এই খবর এসেছে। সে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পরাধীনতা, বঞ্চনা, নির্মম নিষ্ঠুরতার অবসান। আর সেইরকম এক স্বাধীনতার সকালে বেতারের মাধ্যমে আমার কণ্ঠস্বরে প্রভাতী অনুষ্ঠানের সূচনা সে যে কী অনুভূতি তা একমাত্র আমিই জানি।

''দুশো বছর পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিরাট প্রশেসন নিয়ে 'লাল কেল্লার' উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন এবং তিনি ব্রিটিশ পতাকা লালকেল্লার চূড়া হতে নামিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। ঠিক সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমায় গান গাইতে হবে। এ-খবর শুনে আমি আনন্দিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত, গর্বিত। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সঙ্গে সঙ্গে আবার স্টুডিওয় গেলাম এবং সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে পণ্ডিত মাধুরের লেখা ও কমল দাশগুপ্তের সুরে আমি 'সোনেকা হিন্দুস্থান মেরা, সোনেকা হিন্দুস্থান' গাইতে শুরু করলাম। সেটার পর আরও কয়েকটি ভজন পরপর গাইলাম।''

যূথিকা রায় একথাও জানিয়েছেন : ''পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নানা ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভজন শুনেছিলেন। এই স্মৃতি যা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না।''

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ১৯৭০ সালের। সেসময় মহাত্মা গান্ধির জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে অল ইন্ডিয়া রেডিও, পোরবন্দর থেকে যূথিকা

রায়কে আহ্বান জানানো হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন : ‘‘সেই প্রোগ্রামটির বিশেষত্ব ছিল এই যে বাপুজি যে স্থানে এবং যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সেই সময়, সেই জায়গায় বসে বাপুজির প্রিয় ভজন Broadcast করেছিলাম। ভোরবেলায়। মাত্র ৫ মিনিট সময় ছিল। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী (প্রথম মহিলা) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি আমায় বাপুজির জন্মশতবর্ষ উৎসবে, পোরবন্দরে তাঁর প্রিয় ভজন Broadcast করবার জন্য এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে আমায় সম্মানিত করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই Broadcast হয়েছিল সারা বিশ্বে।’’

পোরবন্দরে গান্ধিজীর জন্মস্থল, সৌজন্য:শিল্পী দত্তমুখার্জি
http://myrecenttrips.blogspot.in/2012/02/gujrat.html

তিন

যূথিকা রায়ের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগের শুরু ১৯২৬ সালে। তিনি লিখেছেন, ‘‘১৯২৬ সালে আমি বাবার সঙ্গে একবার কলকাতায় আসি। আমার পিসেমশাই স্বর্গীয় কবিরাজ কালীভূষণ সেন। তিনি এবং তাঁর পরিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন এবং বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের তিনি চিকিৎসা করতেন। আমার পিসিমা (মণিমা) প্রায়ই বেলুড় মঠে যেতেন শ্রীঠাকুরের পূজা দিতে এবং সন্ন্যাসীদের প্রণাম জানাতে। আমরা যখনই কলকাতায় আসতাম, মণিমার কাছে উঠতাম। মণিমা আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যখনই যেখানে যেতেন আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মণিমা আমায় সঙ্গে করে বেলুড় মঠে নিয়ে যান। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসি। মণিমা মহারাজকে বলেন, ‘রেণু আমার ভাইঝি, খুব ভাল গান করে।’ মহারাজের অনুরোধে, ‘মুঠো মুঠো রাঙ্গাজবা কে দিল তোর পায়ে পায়ে’ শ্যামাসঙ্গীতটি শোনাই। মহারাজ এই গানটি শুনে ধ্যানস্থ হয়ে যান। আমাকে প্রভূত আশীর্বাদ করেছিলেন এবং দুই-তিন বার এই গানটি আমায় গাইতে বলেন। সে স্মৃতি আজও আমার মনে গেঁথে আছে।’’

বছর চার-পাঁচ পরের ঘটনা। যূথিকা জানিয়েছেন : ‘‘আমার বয়স যখন এগারো বছর, দিদি সাড়ে তেরো এবং বীণা আট বছরের, সেইসময় আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও পরামর্শ করে ঠিক করলাম মার নির্দেশ মতো আমরা বারো বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে ‘ব্রহ্মচর্য’ পালন করব। বারো বছর পর্যন্ত আমরা মাছ মাংস ডিম খাব না। সাদা সরু পাড় কাপড় পরব। কোনও বিলাসিতার মধ্যে যাব না। এই সঙ্কল্প করলাম। যতদিন না আমরা স্বাবলম্বী হতে পারি ততদিন এই ব্রত পালন করব।... ১৯৩০ সাল, যখন আমরা কলকাতায় আসি দিদি [ও] বীণা বেথুন স্কুল ও কলেজে পড়তে যেত খালি পায়ে সাদা কাপড় পরে। গরমে রাস্তার পিচ গলে পায়ে ফোস্কা পড়ত কিন্তু ব্রত থেকে সরে আসেনি। বারো বছর পূর্ণ হলে দিদি ও বীণা এ ব্রত ছেড়ে দেয়। আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্রত পালন করে চলেছি। দেশ বিদেশে ঘোরা, রেকর্ড করা সব কিছু এই সাদা বেশে করেছি। সহজ সাধাসিধে জীবন আমার ভাল

লেগেছে। আমার বিশ্বাস বিলাসিতার মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে এ-আনন্দ অনেক বেশি। এছাড়া আমি সুরের সাগরে ডুবে যে অসীম আনন্দ অনুভব করি, সে আনন্দের কাছে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না।''

যূথিকার কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে এই মহান আদর্শ গ্রহণ করার প্রেরণা তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মায়ের কাছ থেকে। স্মৃতিকথার এক অংশে যূথিকার মায়ের বিষয়ে আমরা জেনেছি, ''শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর কথা এই আদর্শ নিয়ে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন...।''

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দিলে যূথিকার জীবনের যে-দিকটি নিয়ে আলোচনা করছি তার তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা যাবে না। ১৯৩০ সালে তাঁদের পরিবার টাঙ্গাইল থেকে কলকাতায় চলে আসে এবং কলকাতার ৩৬ বি গোকুল মিত্র লেনের একটি বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এইসময়েই যূথিকা ও তাঁর বোন বীণা সেই কালে প্রায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সিটি গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে যূথিকা জানিয়েছেন : ''...সিটি গার্লস হাইস্কুলে মাত্র এক বছর পড়বার পর ছেড়ে দিই। কারণ স্কুল অনেক দূরে ছিল। আমরা স্কুলের বাসে রওনা হতাম তাড়াতাড়ি কিন্তু ফেরবার সময় সব মেয়েদের ঘুরে ঘুরে নামিয়ে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম। সমস্ত সময়টা আমাদের নষ্ট হত এবং এই অনিয়মের জন্য আমি খুব ভারি অসুখে আক্রান্ত হলাম। তখন মা আমাদের এই স্কুল ছাড়িয়ে নিবেদিতা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। নিবেদিতা স্কুলে আমি ক্লাস নাইন এবং বীণা ক্লাস সিক্সে ভর্তি হল।''

যূথিকার লেখাপড়া সংক্রান্ত পরবর্তী সংবাদের মধ্যে পেয়েছি যে তিনি ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। তবে সংগীতজীবনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাঁর পক্ষে কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি, প্রাইভেটে ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়ার পর তাঁর বিদ্যাচর্চার ইতি ঘটে।

যূথিকার প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ডের উল্লেখ আগে করেছি। সেই সাফল্যের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : ''প্রথম রেকর্ড সফল হওয়ার পর গ্রামোফোন কোম্পানির পক্ষ থেকে আমায় বক্স গ্রামোফোন উপহার দেয়।... প্রথমবার তিন মাসের মধ্যে আমি দেড় হাজার টাকা Royalty পাই। এই টাকা দিয়ে আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদা মায়ের শ্বেত পাথরের ছোট মূর্তি ও রুপোর সিংহাসন তৈরি করাই 'জি পালের' ভাইপো মণি পালকে দিয়ে। এই মূর্তি তৈরি করবার সময় বেলুড় মঠের সাধু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাঁর এই একান্ত সাহায্যে আমি কৃতজ্ঞ। মূর্তি ছোট হলেও অতি সুন্দর নিখুঁত। মনে হয় যেন জীবন্ত ঠাকুর ও সারদা-মা বসে আছেন। প্রতিদিন আমার ছোট বোন বীণা (মল্লিকা) ঠাকুরের সেবা করে। স্নান করায়, ভোগ দেয়, নানারকম ফুল দিয়ে সাজায়। সব কিছু নিষ্ঠার সঙ্গে করে। নানারকম চাদর তৈরি করে গায়ে জড়িয়ে দেয়, সুন্দর সুন্দর তাকিয়া বানিয়ে ঠাকুর ও মাকে বসায়। শীতকালে উলের চাদর বুনে ঠাকুরকে, মাকে সাজায়। বীণার ঠাকুরের প্রতি এই একনিষ্ঠ ভক্তিশ্রদ্ধা সত্যিই শিক্ষণীয়। সন্ধ্যাবেলায় আমি ঠাকুর ও মায়ের আরতি করি, ধূপ জ্বালাই এবং এই প্রার্থনা জানাই—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ জীবনে কভু যেন হইনাকো পথহারা, সুখে রাখো, দুঃখে রাখো, যে বিধান হয় আর যাই কর প্রভু মোরে ছাড়িবে না কভু।' এই প্রার্থনা করে প্রতি সন্ধ্যায় আমি আমার ঈশ্বরকে অন্তরের প্রণাম জানাই।''

মুম্বই শহরে যূথিকার গানের অসম্ভব কদর ছিল, বহুবার তিনি সেখানে গিয়ে নানা অনুষ্ঠান করেছেন। স্বয়ং মোরারজি দেশাই ছিলেন তাঁর

ভজনের গুণগ্রাহী। এমনই কোনও এক মুম্বই সফরের ঘটনার কথা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : ''সে-বছরই আমরা বম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের (খার) হোস্টেল বিল্ডিং তৈরির জন্য একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম। আশ্রমের প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বাবুভাইকে [বাবুভাই মার্চেন্ট] এ বিষয়ে আগে জানিয়েছিলেন। এ প্রোগ্রামে বাবুভাই এবং তাঁর পার্টনার (জয়ন্তীলাল সাহ এবং মানুভাই সাহ) সমস্ত খরচ নিজেরা বহন করে প্রোগ্রামের সব টাকা প্রেসিডেন্ট মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।''

এই সময়ের একটি ঘটনার বিবরণ থেকে বুঝতে পারি যূথিকা রায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কত নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ঘটনাস্থল মুম্বই স্টেশন প্ল্যাটফর্ম, যূথিকা রায় কলকাতা ফিরছেন। অতঃপর তাঁরই বয়ানে শুনি : ''গার্ড সাহেব সবুজ পতাকা উড়িয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। ট্রেন সবে ছাড়বে ঠিক সেইসময় দেখা গেল স্বামীজি ছুটতে ছুটতে আসছেন। স্বামীজিকে দেখতে পেয়ে, বাবা আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। স্বামীজি এসেছেন। স্বামীজি এসেছেন। স্বামীজি খুব জোরে ছুটে এসে বাবার হাতে শ্রীঠাকুরের ফুল ও প্রসাদ দিলেন, ট্রেনও চলতে শুরু করল। আমরা গাড়ির ভিতর হতে, হাতজোড় করে [মুম্বই আশ্রমের] পূজ্য প্রেসিডেন্ট মহারাজ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীকে প্রণাম জানালাম। বাবার হাতে পূজার ফুল ও প্রসাদ দিয়ে, মহারাজজি চেঁচিয়ে বললেন, 'ঠাকুর আছেন, কোনও ভয় নেই।' ট্রেন জোরে ছুটে চলল।'' আন্তরিকতা, স্নেহ ও বিশ্বাসের এক নিখুঁত চিত্র।

এবার গুজরাটের রাজকোট শহরের প্রসঙ্গ। যূথিকা জানিয়েছেন : ''রাজকোট বা গুজরাতে যখনই আমি কোনও অনুষ্ঠানের জন্য গেছি, আভা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজকোটে আমি রামকৃষ্ণ গেস্ট হাউসে থাকতাম। রাষ্ট্রীয়শালা রামকৃষ্ণ আশ্রমের খুব কাছেই। এখানেই [তিনি] থাকতেন এবং আমি আশ্রমে গেলে, আভা গান্ধী আর তার স্বামী কানু গান্ধী সকলেই এই আশ্রমে আসতেন। এঁরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা, সকল সাধুর সেবা করা, আশ্রম রক্ষা করা সবই যেন এঁদের নিজেদের কাজ বলে মেনে নিয়েছেন। পরে এঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে। এই গান্ধী পরিবার আমার ভজন গানকে অসম্ভব শ্রদ্ধা ভক্তি করত। রাষ্ট্রীয়শালায় আমি থেকেছি। আভা আমায় নিজের দিদির মত শ্রদ্ধা করে ভালবাসে। তার সেবাযত্ন আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। আভা দেখতে সুন্দরী, শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের। গান্ধীজীর আদর্শে সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সকলকে ভালবেসে আপন করে নেওয়া তার আর এক গুণ। আভাকে কখনও ভোলা যায় না।''

এবার দীক্ষাপ্রসঙ্গ। এই পরিসরে পেয়েছি এক ভক্তিপূর্ণ শিল্পীর আত্মনিবেদনের কাহিনি, সেইসঙ্গে জেনেছি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের নিবিড় চিত্র—ঐতিহাসিক মূল্যে যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যূথিকার নিবেদন : ''১৯৪০ সাল, অনেকদিন হতে মা আমাদের ভাইবোনের বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামে দীক্ষিত করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুযোগ করতে পারছিলেন না। তখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজ। স্বামী বিরজানন্দজি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত এবং পূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। মঠের তখনকার নিয়ম ছিল কেবলমাত্র প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছাড়া আর কোনও মহারাজ দীক্ষা করতে [দিতে] পারবেন না। তাই প্রেসিডেন্ট মহারাজজি যখন মঠে থাকতেন তখন দীক্ষা নেবার জন্য অসম্ভব ভিড় হত। অনেক আগে

থেকে নাম নথিভুক্ত করতে হত। নাম না উঠলে দীক্ষা দেওয়া হত না। প্রেসিডেন্ট মহারাজকে মাঝে মাঝে বাইরে সেন্টারে যেতে হত। দীক্ষা দেবার জন্য। তাই বেলুড়মঠে যখনই আসতেন, অসম্ভব ভক্তের ভিড় বেড়ে যেত। মা খোঁজ নিয়ে জানলেন, পূজ্য মহারাজজি বেলুড় মঠে এসেছেন অল্পদিনের জন্য এবং ভক্তদের দীক্ষা দিচ্ছেন। দুইদিন বাদে আমার গ্রামোফোন কোম্পানিতে সকালে রেকর্ডিং এবং ওইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে বাবা ও আমি বম্বের অভিমুখে রওনা হব ঠিক ছিল। ইতিপূর্বে মা একলা বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামীজীর কাছে আমার দীক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন, মার কথা শুনে, স্বামীজী বললেন—'এখন তো মা দীক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা দীক্ষা নেবেন, তাঁদের নাম অনেক আগে লেখা হয়ে গেছে। তাই এখন কোনমতেই সম্ভব নয়, পরের বছর হবে, নাম লিখে দিয়ে যান।' মা বললেন, 'পরের বছর? অনেক দেরি, এর মধ্যে অনেক রকম বাধাবিঘ্ন ঘটতে পারে।' তাই মা নিরুপায় হয়ে ভারাক্রান্ত মনে, গভীর চিন্তা নিয়ে মঠ থেকে ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ আমাদের বিশেষ পরিচিত, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজজির সঙ্গে মার দেখা হয়। মাকে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে চিন্তিত অবস্থায় একলা ঘুরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা! কী ব্যাপার? আপনি একলা এই প্রখর রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?' মা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'মহারাজ, রেণুর (যূথিকা) দীক্ষার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু হল না। নামের লিস্ট সব আগে হয়ে গেছে। তাই হল না।' পূজ্য স্বামী পূর্ণানন্দজি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে কি মা? রেণুর দীক্ষা হবে না? আমি এখনই রেণুর নাম পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মা শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'কিন্তু কালই রেণু সন্ধ্যায় বম্বে চলে যাবে, তার আগেই ওর দীক্ষা হওয়া বিশেষ দরকার।' আরও বললেন, 'দেখুন মহারাজ! রেণু তার বুড়ো বাপের সঙ্গে অজানা অচেনা দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, আমার বড় ভয় হয়। কখন কি বিপদ ঘটে। এখনকার দিনকাল ভাল নয়। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যদি ও যায়, কোন বিপদ ওকে ছুঁতে পারবে না। সেই জন্য বম্বে রওনা হবার আগেই আমি রেণুকে দীক্ষাটা দিয়ে নিতে চাই।' পূর্ণানন্দ মহারাজজি বললেন, 'কোন ভয় নেই মা। কাল সকালে ১২টার মধ্যে রেণুকে নিয়ে মঠে আসবেন, বিকাল ৬টার মধ্যে দীক্ষা হয়ে যাবে।'

''পরের দিন দমদম স্টুডিও থেকে গানের রেকর্ডিং শেষ করে বেলা ১১টায় মা ও আমি বেলুড় মঠে গেলাম দীক্ষা নেবার জন্য। বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে দোতলায় স্বামী বিবেকানন্দজি যে ঘরে থাকতেন তারই পাশের ঘরে আমাদের দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম সামনে একটি চেয়ারে প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বিরজানন্দজি বসে আছেন। নিচে ভক্তগণ দীক্ষা নেবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি ঘরে ঢুকে পূজ্য মহারাজজিকে প্রণাম করলাম। আমার মাথায় হাত রেখে গুরুজী আশীর্বাদ করলেন। আমি একদম গুরুমহারাজজির সামনে বসলাম। সামনে ছোট টেবিলের উপর ধূপকাঠি, দেশলাই, ফুল, চন্দন প্রভৃতি ছিল। গুরু মহারাজজি আমায় সামনের ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতে বললেন। একসঙ্গে ৩/৪টি ধূপকাঠি আমি ধরিয়ে দিলাম। এরপর তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা সকলেই এক ইষ্টনাম মন্ত্র নেব কিনা? আমরা সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র নেব শুনে দীক্ষার সবকিছু নিয়ম, ভাব এক এক করে দেখাতে লাগলেন। প্রথম আসন কি ভাবে করতে হবে? গুরুমহারাজজি স্থির ও ভাবঘন শান্ত মূর্তিতে ধ্যানে বসলেন। তাঁর সেই স্থির ভাবঘন শান্ত সৌম্য মূর্তি আজও আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে। এরপর কিভাবে ধ্যান করতে হবে, কিভাবে জপ, কিভাবে আসন করে বসতে হবে, নিজে এক এক করে সব

সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিলেন। এরপর বীজমন্ত্র দিলেন।

''দীক্ষা শেষ হবার পর আমরা একে একে গুরু মহারাজজিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পরে মঠে একসঙ্গে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পেলাম। মা কিন্তু সারাদিন উপোষ করে থাকলেন শুধু আমার দীক্ষার জন্য। মঠ থেকে ফেরবার আগে মা ও আমি গুরু মহারাজজিকে প্রণাম করতে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, পূর্ণানন্দ মহারাজজি বড় খুশিতে ভরে আছেন। কত ভক্ত এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামমন্ত্র নিচ্ছে তাঁর চোখেমুখে এক পরম আনন্দময় ভাব ফুটে উঠেছিল। আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করে মাকে বললেন, 'মা! এখন তুমি নিশ্চিন্ত? তোমার আর কোন ভয় নেই তো? সত্যই তুমি তোমার কন্যার জন্য সত্যপথ দেখিয়েছ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমিও যূথিকার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করব।'

''১৯৪২ সালে আমার দীক্ষা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে মা আবার সব ভাইবোনদের জন্য দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কেবল ভাই কালীপদ ছাড়া। কারণ তখন সে লন্ডনে পড়তে গিয়েছিল। সব ভাইবোনদের দীক্ষার পর এবারও গুরু মহারাজজি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মা, এবার তুমি নিশ্চিন্ত হলে তো? সব সন্তানের দীক্ষা হল?' মা বললেন, 'বাবা, একটি ছাড়া সকলের দীক্ষা হল। কালীপদ লন্ডনে পড়তে গেছে। এক বছর পরে ফিরে আসবে।' গুরুমহারাজজি শুনে বললেন— 'হবে হবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় সব হবে।' আমরা সত্যই ভাগ্যবান, কারণ মার জন্য যে গুরুদেবের কাছে আমরা বীজমন্ত্র পেলাম, তা অনেক জন্মের তপস্যা থাকলে এমন গুরু পাওয়া যায়।''

চার

যূথিকা রায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের বেশ কিছু চিত্র আমরা তাঁর স্মৃতিকথা থেকে পেয়েছি। যেমন, তিনি যখন সিংহল যান তখন তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমে। শুধু তাই নয়, সেসময় আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধার্থানন্দজী তাঁকে প্রায় অভিভাবকের স্নেহে আগলে রেখেছিলেন। যূথিকা লিখছেন : ''স্বামী সিদ্ধার্থমহারাজজি টাউন হলের প্রোগ্রাম সফল হবার জন্য যে পরিশ্রম করেছিলেন, তা চিরদিন মনে রাখবার মত। স্বামীজীর আশীর্বাদ এবং আন্তরিক সাহায্য না পেলে সিংহলে প্রোগ্রাম করা বা সিংহল দ্বীপ দেখা কিছুই আমাদের সম্ভব হত না।''

অন্য আর একটি ঘটনা। সেসময় আকস্মিক পিতৃবিয়োগের কারণে যূথিকা রায় বিহ্বল। চতুর্দিক যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, মনে উৎসাহ ও আনন্দের লেশমাত্র নেই। তিনি নিজেই জানিয়েছেন : ''এই ভীষণ বিপদের সময় রাঁচি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সেক্রেটারি স্বামী আত্মস্থানন্দজী আমাদের আশ্রমে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোর রশ্মি দেখতে পেলাম। তাই আমরা সকল ভাইবোনেরা আনন্দের সঙ্গে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। মা বাড়িতে ছিলেন। ওই মিশনে আমাদের থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা যে গেস্ট হাউসে ছিলাম, সেটিও অতি সুন্দর। জানালা খুললেই চোখে পড়ত অসীম নীল আকাশ, সবুজ ঘাসে ঢাকা খোলা মাঠ, দূরে পাহাড় শ্রেণীর পাঁচিল যেন সমস্ত জায়গাটাকে বাইরের কোলাহল থেকে রক্ষা করছে। ভোরে নানা পাখির কূজন, রাতে অন্ধকারে জোনাকির মিটিমিটি আলো ও ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। এই সব কিছুর মধ্যেই আমরা পেলাম নতুন আনন্দ, নতুন উদ্যম। এই মিশনের কিছুদূরে টি. বি. হাসপাতাল। পূজনীয় সত্যকৃষ্ণ মহারাজের [স্বামী আত্মস্থানন্দ] সঙ্গে আমরা এই হাসপাতাল দেখলাম। এই টিবি

হাসপাতালের জন্য আমরা একটি চ্যারিটি অনুষ্ঠান করি। পরে স্বামীজি আমাদের ও অন্যান্য গেস্টদের নিয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখান। আমরা নতুন উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। তাই মনে হয়, পূজ্য মহারাজ যে আমাদের এই বিপদের সময় কত উপকার করেছিলেন, তা কোনদিন ভুলতে পারব না। তাঁর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।"

যূথিকার স্মৃতিকথার পাতায় ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কল্পতরু উৎসবে যোগদানের অভিজ্ঞতার কথাও বিশদে পেয়েছি। নানা কথার মধ্যে তিনি সহজ ভাষায় নিজেকে মেলে ধরেছেন : "আমরা সকাল সাড়ে ছটায় পৌঁছেছিলাম।... বিরাট লাইনে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। এক পা, এক পা করে ঠাকুর বাড়ি পৌঁছালাম। প্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে প্রণাম জানিয়ে উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে এলাম।... বেলুড় মঠ থেকে অনেক সাধু এসেছিলেন... সারদা মঠ ও নিবেদিতা স্কুল থেকে অনেক সন্ন্যাসিনী এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে প্রণাম জানাতে। খুব ভাল লাগছিল।... শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্রস্থান চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত প্যান্ডেল থেকে বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ, সাধুভক্তের সমাবেশে স্থানটি যেন মহাতীর্থ পুণ্যভূমি মনে হয়েছিল, যা কখনও ভোলা যায় না।"

শেষ করব রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রসঙ্গ দিয়ে। এই আশ্রমে একাধিক বার যূথিকা গিয়ে থেকেছেন। কিন্তু যে-বর্ণনা এখানে তুলে ধরব তার অন্য একটি মাত্রা পাঠক নিশ্চিত লক্ষ করবেন। যূথিকার স্মৃতিচারণের অংশ : "১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল রাজকোটে নতুন শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা উৎসব আরম্ভ হয় এবং ৭ দিন ব্যাপি এই উৎসব চলে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সাধু ও ভক্তের বিরাট সমাগমে আশ্রম প্রাঙ্গণ এক পবিত্র মহাতীর্থে পরিণত হয়। পূজনীয় স্বামী সত্যকৃষ্ণ মহারাজের আমন্ত্রণে, এই পবিত্র মহোৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য লাভ করি। সেইসময় সারা রাজকোট শহর শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে যেন মহাতীর্থ পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল।... বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন। সেইজন্য আমরা আশ্রমের গেস্ট হাউস পেলাম না। পুরুষোত্তম ভাই আমাদের রাষ্ট্রীয়শালায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে কানু গান্ধীর [মহাত্মা গান্ধীর ভাইপো নারায়ণদাস গান্ধীর পুত্র] স্ত্রী আভা গান্ধী [১৯৪০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান পর্যন্ত তাঁর নিত্যসঙ্গী] আমাদের সঙ্গে ছিল। আভা আমার ছোট বোনের মত।... বীর্জাবেন (পুরুষোত্তম ভাইয়ের স্ত্রী) ও আভা দুজনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত এবং বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমের সেবা করে চলেছে। রাষ্ট্রীয়শালার পুরুষোত্তম ভাই ও সকলেই ঠাকুরের ভক্ত তাই এই বিশেষ উৎসব সফল করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

"পরের দিন নগরসংকীর্তন। এখানে সাধুভক্ত, গৃহী, রাষ্ট্রীয়শালার শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী এবং অন্ধ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সকলে যোগদান করেন। আমি ও আভা এবং আরও অনেকে গাইতে গাইতে চলেছিলাম। অনেকে হাততালি দিয়ে ভাবের ঘোরে নেচে নেচে গাইছিলেন।

" 'জয়তু জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ' গানের সঙ্গে হাতে তালি দিয়ে নাচতে নাচতে সকলেই লাইন করে চলতে শুরু করেন। আমার মনে হয়, রাজকোট শহরে কেউ বাকি ছিলেন না। সকলেই এই নগর সংকীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন। একটি লরিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট প্রতিমূর্তি সুন্দরভাবে ফুল-মালা দিয়ে সাজানো ছিল এবং আশ্রমের সন্ন্যাসীরা হাতে ধূপদানি নিয়ে নাচতে নাচতে এবং গাইতে গাইতে, আরতি করতে করতে যাচ্ছিলেন।

"বেলুড় মঠের পূজ্য প্রেসিডেন্ট মহারাজ,

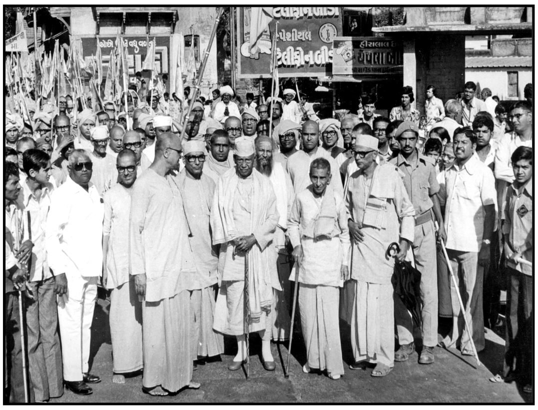

রাজকোট মন্দির প্রতিষ্ঠা: নগরসংকীর্তন
সৌজন্য:স্বামী সর্বস্থানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন রাজকোট

পূজনীয় ভরত মহারাজও এই মহাসংকীর্তনে যোগ দিয়েছিলেন।

“প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে কত অপূর্ব আলোচনা হত। আশ্রমের নিয়ম, এইসব অনুষ্ঠানে কোন মহিলা শিল্পী অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সেই কারণে এখানে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে অনুষ্ঠান শুনতাম। সকলের মত আমিও একজন শ্রোতা।

“কিন্তু ৩/৪ দিন পর হঠাৎ ভক্তের দল আমায় গাইবার জন্য ঘিরে ধরলেন। আশ্রমের নিয়ম জানা সত্ত্বেও তাঁরা কোন বাধা মানতে রাজি নন। আমি অনেক ভাবে তাঁদের শান্ত করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সব কথা অগ্রাহ্য করে ভক্তের দল ছুটলেন প্রেসিডেন্টের কাছে আমাকে গান গাওয়ার অনুমতির জন্য। প্রেসিডেন্ট মহারাজ ভক্তগণের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আমাকে গাইবার অনুমতি দিলেন। ভক্তের জয় হল।... আমি এই সুন্দর সাজান প্যান্ডেলে ও নতুন মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে ভজন গেয়েছিলাম।

“উৎসবের শেষদিন, সত্যকৃষ্ণ মহারাজ আমায় নতুন মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে নিয়ে যান এবং পূজারির কাছ থেকে ফুল চন্দন নিয়ে ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা করেন। নতুন মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে বসে ফুল, চন্দন হাতে নিয়ে আমি প্রাণভরে প্রার্থনা করি তাঁর চরণে। আমার সব দুঃখ-ব্যথা নিমেষে কোথায় ভেসে যায়। আমার পরম সৌভাগ্য আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রণাম করি।”

## উপসংহার

কলকাতা রবীন্দ্রসদনে ৬ এপ্রিল ১৯৭৬ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গ্রামাফোন কোম্পানি কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ শিল্পীকে গোল্ডেন ডিস্ক উপহারে সম্মানিত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যূথিকা রায়, আঙুরবালা, কানন দেবী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ইন্দুবালা এবং কমলা ঝরিয়া। দেশ পত্রিকায় ওই অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনের একটি অংশ: “ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের মর্মরসটুকু নিংড়ে নিয়ে অথচ তার অনুকরণ না করে বাংলা গান রূপস্বাতন্ত্র্যে এবং স্বকীয় মেজাজের দীপ্তিতে যে কী আশ্চর্য রমণীয়তা অর্জন করেছিল, কাব্যসঙ্গীতের যে কী এক অনবদ্য রূপ একদা বাংলা গানে ফুটে উঠেছিল, যূথিকা রায় এবং আঙ্গুরবালা সেই বিস্মৃত অধ্যায়ের পৃষ্ঠাগুলি আবার মেলে ধরলেন। প্রণব রায়ের লেখা, কমল দাশগুপ্তের সুরে ‘আমি ভোরের যূথিকা’য় সেই ভোরের ফুলের আঘ্রাণটুকু অনায়াসেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন আজকের প্রবীণা যূথিকা রায়।”

প্রতিভাময়ী শিল্পী যূথিকা রায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যানের অমূল্য অংশ চয়নের তাগিদেই এই রচনার অবতারণা। সেই প্রয়াস নিশ্চিতভাবে আমাদেরও ঋদ্ধ করেছে।

এই আখ্যানের প্রেরণা ও তথ্যাংশ যূথিকা রায় রচিত ‘আজও মনে পড়ে’ (মঞ্জুভাষ, কলকাতা, ২০১৩) গ্রন্থের কাছে ঋণী।